ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম ও ভক্তিযোগ -- ঈশ্বরপ্রেম

বঙ্কিম (ঠাকুরের প্রতি) -- মহাশয়, ভক্তি কেমন করে হয়?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ব্যাকুলতা। ছেলে যেমন মার জন্য মাকে না দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে লাভ করা পর্যন্ত যায়।

“অরুণোদয় হলে পূর্বদিক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের আর দেরি নাই। সেইরূপ যদি কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যক্তির ঈশ্বরলাভের আর বেশি দেরি নাই।

“একজন গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, মহাশয়, বলে দিন ঈশ্বরকে কেমন করে পাব। গুরু বললে, এসো আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাকে সঙ্গে করে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নামল, এমন সময় হঠাৎ গুরু শিষ্যকে ধরে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক পরে ছেড়ে দিবার পর শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়াল। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি রকম বোধ হচ্ছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ যায় যায় বোধ হচ্ছিল, প্রাণ আটু-পাটু করছিল। তখন গুরু বললে, ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ ওইরূপ আটু-পাটু করবে, তখন জানবে যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের দেরি নাই।

“তোমায় বলি, উপরে ভাসলে কি হবে? একটু ডুব দাও। গভীর জলের নিচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত-পা ছুঁড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারী হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নিচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।”

বঙ্কিম -- মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। (সকলের হাস্য) ডুবতে দেয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ পেটে যায়। তাঁর নামেতে কালপাথ কাটে। ডুব দিতে হবে, তা না হলে রত্ন পাওয়া যাবে না। একটা গান শোন:

ডুব্ ডুব্ ডুব্ রূপ-সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবে রে প্রেমরত্নধন ॥
খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ্ দীপ্ দীপ্ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ ॥
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
কুবীর বলে শোন্ শোন্ শোন্ ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥

ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুর্লভ মধুর কণ্ঠে এই গানটি গাইলেন। সভাসুদ্ধ লোক আকৃষ্ট হইয়া একমনে এই গান শুনিতে লাগিলেন। গান সমাপ্ত হইলে আবার কথা আরম্ভ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কিমের প্রতি) -- কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করে শেষকালে কি পাগল হয়ে যাব? যারা ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব লোক এটি বোঝে না যে সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

আমি নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর যে, এক খুলি রস আছে, আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোন্‌খানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আড়ায় (কিনারায়) বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে জড়িয়া মরে যাব। তখন আমি বললুম, বাবা সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ-রস অমৃত রস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না; অমর হয়।

“তাই বলছি ডুব দাও। কিছু ভয় নেই, ডুবলে অমর হয়।”

এইবার বঙ্কিম ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন -- বিদায় গ্রহণ করিবেন।

বঙ্কিম -- মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয়। একটি প্রার্থনা আছে -- অনুগ্রহ করে কুটিরে একবার পায়ের ধুলা --

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা।

বঙ্কিম -- সেখানেও দেখবেন, ভক্ত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- কি গো! কি রকম সব ভক্ত সেখানে? যারা গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো কি? (সকলের হাস্য)

একজন ভক্ত -- মহাশয়, গোপাল, গোপাল, ও গল্পটি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসিতে হাসিতে) -- তবে গল্পটি বলি শোন। এক জায়গায় একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, প্রায় হাতে হরিনামের ঝুলি আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের জন্য স্যাকরার কর্ম করা; মাগছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে; কেননা, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনা-রূপা গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম, করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যাই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, ‘কেশব! কেশব! কেশব!’ খানিকক্ষণ পরে আর-একজন বলে উঠল, ‘গোপাল! গোপাল! গোপাল!’ আবার একটু কতাবার্তা হতে না হতেই আর-একজন বলে উঠল -- ‘হরি! হরি! হরি!’ গয়না গড়বার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল, তখন আর-একজন বলে উঠলো -- ‘হর! হর! হর! হর!’ কাজে কাজেই এত ভক্তি প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল; জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

“কিন্তু কথা কি জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলেছিল ‘কেশব! কেশব!’ তার মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা আসলো এরা সব কে? যে বললে, ‘গোপাল! গোপাল!’ তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, ‘হরি! হরি!’ তার মানে এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে তবে ‘হরি’ অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, ‘হর! হর!’ তার মানে এই যেকালে গোরুর পাল দেখছো, সেকালে সর্বস্ব হরণ কর।’ এই তারা পরমভক্ত সাধু।” (সকলের হাস্য)

বঙ্কিম বিদার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু একাগ্র হয়ে কি ভাবিতেছিলেন। ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসিয়াছেন। গায়ে শুধু জামা। একটি বাবু চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া আসিয়া চাদর তাঁহার হস্তে দিলেন। বঙ্কিম কি ভাবিতেছিলেন?

রাখাল আসিয়াছেন। তিনি বৃন্দাবনধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে কিছুদিন ফিরিয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার কথা শরৎ ও দেবেন্দ্রের কছে বলিয়াছিলেন ও তাঁহার সহিত আলপা করিতে তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ পরিতে উৎসুক হইয়া আসিয়াছিলেন। শুনিলেন, এঁরই নাম রাখাল।

শরৎ ও সান্যাল এঁরা ব্রাহ্মণ, অধর সুবর্ণবণিক। পাছে গৃহস্বামী খাইতে ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা নূতন আসিতেছেন; এখনও জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভালবাসেন। ঠাকুর বলেন, “ভক্ত একটি পৃথক জাতি। সকলেই এক জাতীয়।”

অধর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে ও সমবেত ভক্তদের অতি যত্নপূর্বক আহ্বান করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। ভোজনানন্তে ভক্তগণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর কথাগুলি স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার অদ্ভুত প্রেমের ছবি হৃদয়ে গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অধরের বাটীতে শুভাগমনের দিনে শ্রীযুক্ত বঙ্কিম শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার বাটীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত গিরিশ ও মাস্টারকে তাঁহার সান্কীভাঙার বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। ঠাকুরকে আবার দর্শন করিতে আসিবার ইচ্ছা বঙ্কিম প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্যগতিকে আর আসা হয় নাই।

[*দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে ‘দেবী চৌধুরানী’ পাঠ*]

৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অধরের বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুভাগমন করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবুর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। প্রথম হইতে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সব কথা বিবৃত হইল।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে বঙ্কিম প্রণীত দেবী চৌধুরাণীর কতক অংশ পাঠ শুনিয়াছিলেন ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের বিষয় অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটীমূলে চাতালের উপর অনেক ভক্তসঙ্গে বসিয়াছিলেন। মাস্টারকে পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিলেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক (শিবানন্দ), প্রসন্ন (ত্রিগুণাতীত), সুরেন্দ্র প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।